দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প : চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিনী

প্রহ্লাদ রায়

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
...
হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।'[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহুয়া' কাব্যের অতি সাধারণ বাঙালি মেয়েটা আজ আর বাক্যহীনা নয়; 'সবলা'। বিধাতা নয়, সময়ের অনিবার্য নিয়মে স্বকীয় প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতার প্রভাবে সে অর্জন করেছে আত্ম-অধিকার। তার শোণিতকণিকায় যে রুদ্রবীণা ছিল প্রকাশোন্মুখ; বর্তমানে প্রতিটি মুহূর্তে তা সুমধুর সুর-সহযোগে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে আর অন্তঃপুরের মেয়ে নয়, নিত্য অফিস যাত্রী। নারী চরিত্রের এই স্বাধিকার অর্জন এবং আত্মপরিচয় নির্মাণের জন্য চাকুরিজীবী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের বহুচর্চিত ও গবেষণালব্ধ বিষয়ের অন্যতম। কবিতা, নাটক, উপন্যাসের মতো স্বাতন্ত্র্যসূচক নবীনতর সাহিত্য-শাখা ছোটগল্পেও নারী চরিত্রের বর্ণাঢ্য জীবনকথা চিত্রায়িত। সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বাংলা ছোটগল্পের সূচনা।[৩] গোড়া থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের পথ পরিক্রমণ করলে দেখা যায়, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জীবনচর্যার বহুমুখী চালচিত্র। একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও সম্মানিত জীবনযাপনের প্রথম শর্ত– অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন। তবে একথা ঠিক, শুধু অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দিয়ে নয়, মানুষ স্বাধীন হয় চেতনার স্বাধীন সত্তা দিয়ে। আবার এও সত্য যে, স্বাধীন সত্তা গঠনের প্রথম ও নিশ্চিত পদক্ষেপ– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।[৪] তাই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়েরা রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের অচলায়তন ভেঙে বহির্জগতের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে। তবে স্বীকার করতেই হবে, সূচনাকালে রক্ষণশীলতার পুরোনো কাঁটাতার নারীর যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করলেও পরবর্তী সময়ে পুরুষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও প্রেরণা তাদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ইন্ধন জুগিয়েছে।

---

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৮, পৃ. ৬৩১-৬৩২

৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, পৃ. ১৭০

৪ সোহিনী সিনহা, চাকুরিজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা (উনিশ থেকে বিশ শতক), অরুণা প্রকাশন, কলকাতা-০৯, অরুণা প্রকাশন সংস্করণ : জুন ২০১৫, পৃ. ক

আত্মপ্রকাশে আগ্রহী, অর্থাৎ চাকুরিজীবী নারীরা ছিল বেশিরভাগই নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের 'নারী'।

সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকেই কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অকৃত্রিম। তবে সেই কাজ (সন্তানের জন্মদান, প্রতিপালন, গৃহকার্য)-কে উপার্জনভিত্তিক কর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। ফলস্বরূপ, তাদের কোনো উপার্জন বা মজুরি না থাকাই স্বাভাবিক।[৫] অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে অশিক্ষিত ধাই, দাসী এবং বারবণিতাদের স্বাধীন উপার্জন ছিল। শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েরা সংসার নির্বাহের জন্য পুরুষকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেছে। সার্থকভাবে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সেই ভূমিকার সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বীকৃতি ছিল না।[৬] নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা জীবন নির্বাহের তাগিদে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত রক্ষণশীল মানসিকতার কারণে নারীকে ঘরের বাইরে পদার্পণ করতে দেয় নি। সে কারণে, বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীরা দীর্ঘদিন পুরুষের উপর ভরসা করেছে, আর ভরসা করছে নিজের নিয়তির ওপরে এবং অন্তঃপুরে বসে পালন করে চলেছে গৃহকার্যাদি। বহির্জগৎ তাদের কাছে ছিল স্বপ্নলোকের কল্পনামাত্র। এর সমর্থনে সমালোচক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মরণীয়–

> বাইরের দুনিয়া বলতে সে কালের মেয়েদের ছিলটাই বা কী! রান্নাবান্না, ঘরকন্না, সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং সন্তান প্রতিপালন– ব্যস্, ওই টুকুনিই তো তখন তাঁদের পৃথিবী। সংসারটুকুই তাঁদের ত্রিভুবন, যদিও সেখানেও তাঁদের মতামতের মূল্য নেই। সে এক একান্তই হাত-পা বাঁধা জীবন। উঠোন পেরোনোর অধিকার নেই, খোলা চোখে তাকানো মানা, তেপান্তরের মাঠ দৃষ্টিসীমার বাইরে। অগত্যা কী আর করা ... পরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, কোনওক্রমে শুধু ইহজন্মটা কাটিয়ে দাও।[৮]

অন্যদিকে, ঘরের বাইরে পরিচিত হওয়ার কিংবা নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েও আর্থিক টানাপোড়েনের অভাবে উচ্চবিত্ত ঘরের বাঙালি নারীরা উপার্জনভিত্তিক কর্মজগতে প্রবেশ করে নি। বরং, 'অবিবাহিত অবস্থায় পিতার সংসারেই হোক আর বিবাহ পরবর্তী

---

৫ সুকুমারী ভট্টাচার্য, বৈদিক যুগে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা-১২, তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩৯

৬ গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ২০০১, পৃ. ৭৫

৭ মধুমিতা আচার্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, কমলিনী, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২

৮ সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গল্প উপন্যাসে বাঙালিনী নিজেকেই দেখতে চান, অভীক সরকার (সম্পাদিত), দেশ, বাঙালিনীর রুচিবদল, ৬৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা : ১৮ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৮

জীবনে স্বামীর সংসারেই হোক, আর্থিক সচ্ছলতার কারণে অর্থ-উপার্জনের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।'[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা ছিল বিশেষভাবে শোচনীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে অন্তঃপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত সামাজিক বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করে নারীসমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আসে। এবং স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে।[১০] পুরোনো রক্ষণশীলতার কারণে পথ কণ্টকাকীর্ণ হলেও শিক্ষিত হওয়ার পরে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা হ্রস্বগতিতে উপার্জনভিত্তিক কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ক্ষয়িষ্ণু সময়পর্বে মধ্যবিত্ত বাঙালিনী পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনে কিংবা স্বনির্ভরতা, আত্মমর্যাদাবোধের তাগিদে সমাজের ধমনিতে প্রবাহিত রক্ষণশীলতার চোরাস্রোতকে উপেক্ষা করে লড়াকু মনোভাব নিয়ে চাকুরিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, আর্থিক স্বনির্ভরতা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস, পায়ের তলার মাটি জুগিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছে অনেক জটিলতার। 'এই ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সবকিছুকে সঙ্গে নিয়েই সে যুগের মেয়েরা পথ চলেছে, ঘরে এবং বাইরে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেকে।'[১১] সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে সে কারণেই বলেছিলেন— 'মেয়েদের জীবন তো জীবনভর ম্যানেজেরই কৌশল।'[১২]

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক বিভিন্ন কারণে ভারতের ইতিহাসে একটি উত্তাল সময়। এই উত্তাল সময়পর্বের দাবদাহে বাঙালির জীবনচর্যা দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। পরাধীন ভারতবর্ষের শাসকপ্রভু ইংরেজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত থাকায় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষও এ যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। কারণস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বাংলা ও বাঙালির জীবনকে। যুদ্ধের ফলে দেশে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সর্বাত্মক দুর্নীতি এবং খাদ্য সংকট; যার পরিণাম ১৯৪৩-এর সর্বক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ। কলকাতার পথে ঘাটে তখন অজস্র বুভুক্ষু মানুষের 'ফ্যান দাও', 'ফ্যান দাও' আর্তনাদ। জীবনানন্দীয় কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা খুব দ্রুত ভগ্ন ও ধ্বস্ত হাড়, পাঁজর নিয়ে

---

৯ মধুমিতা আচার্য, পূর্বোক্ত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, পৃ. ১২

১০ তপস্যা ঘোষ, বাঙালি মেয়ে– উনিশ থেকে একুশে, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৯ মে ২০১৫, পৃ. ২০০

১১ মধুমিতা আচার্য, পূর্বোক্ত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, পৃ. ১৫

১২ আশাপূর্ণা দেবী, সাক্ষাৎকার, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ২ ডিসেম্বর ১৯৯০। - দ্র. শম্পা চৌধুরী, নব্বই-এর মধ্যবিত্ত ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য-র গল্প, সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), বাংলা গল্প ও গল্পকার-৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১০৫

কঙ্কালসার হয়ে পড়ে, অন্যদিকে রূপসী গ্রামবাংলার সেই চিরন্তন সৌন্দর্য অবলুপ্তপ্রায়।[১৩] যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির হাত ধরে বাংলা শব্দকোষে যে 'কালোবাজারি' শব্দটির প্রবেশ ঘটে, তার শিকার শুধু গরিবরাই হয় নি, তা 'বাঁধা মাসমাহিনার বেতনভুক'[১৪] মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপরেও সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯৪৬-এ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'[১৫] দিবসে কলকাতায় ঘটে নজিরবিহীন, রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার সূত্র ধরে ১৯৪৭ সালে আসে একদিকে গৌরবজনক, অন্যদিকে খণ্ডিত ও ট্রাজিক স্বাধীনতা।[১৬] যে স্বাধীনতা সঙ্গে এনেছে দেশভাগ ও দলে দলে উদ্বাস্তুদের ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায়, বিশেষ করে নগর কলকাতায়। ফলে মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আর কলকাতার সমস্যা মানেই মধ্যবিত্তের সমস্যা। কারণ– 'মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা। কলকাতার মনও মধ্যবিত্তের মন।'[১৭]

স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্বে আর্থিক সংকট হেতু বাংলার গ্রামের মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাজের তাগিদে যেমন শহরে এসেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিবাসীরাও আশ্রয় নিতে থাকে শহরে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ফলে শহরের রূপ (আয়তন) ও কর্মজীবনে দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটে। 'মধ্যবিত্তের শহর' কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপরেও অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয় নি, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসার নির্বাহের খরচ (cost of living) হয়ে উঠেছে অধিক থেকে অধিকতর। পরিণাম স্বরূপ, বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য এই শ্রেণিকে নতুন পথের সন্ধান করতে হয়েছে। এবং সংসার জীবনে সচ্ছলতা বা মধ্যবিত্তীয় আভিজাত্যকে বজায় রাখার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীকেও যুক্ত হতে হয়েছে উপার্জনভিত্তিক কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে। শুধু শিক্ষার অগ্রগতি কিংবা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যই নয়, সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজবাস্তবতার অভিশাপ (অর্থনৈতিক দুরবস্থা) থেকে সংসারকে রক্ষার তাগিদে মেয়েরা সামাজিক বন্ধনজালকে উপেক্ষা করে চাকরিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।

নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সূচনা স্বাধীনতা পূর্বযুগে স্বল্প পরিমাণে লক্ষ করা গেলেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের নিগূঢ় আর্থিক অনটনই অধিক সংখ্যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের চাকরি জগতে আসতে বাধ্য করেছে। প্রথম দিকে (উনিশ

---

১৩ ফাল্গুনী তপাদার, ছোটগল্পের গুণময় মান্না, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: মহালয়া ২০১৭, পৃ. ৯

১৪ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বাংলায় সন্ধিক্ষণ : ইতিহাসের ধারা (১৯২০-১৯৪৭), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লি-০২, প্রথম বাংলা সংস্করণ : ২০১৮, পৃ. Xiii.

১৫ তদেব, পৃ. Xiv.

১৬ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, উদ্বাস্তু স্রোত ও বাংলার জনজীবন, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, তৃতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৫, পৃ. ১৭১

১৭ বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ (প্রকাশ ভবন) : আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৮

শতক ও বিশ শতকের সূচনাপর্বে) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল মানসিকতা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথে বাধা দিলেও পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার প্রশ্নে আস্তে আস্তে রক্ষণশীল পরিবারগুলি বাধ্য হয়েছে তাদের রক্ষণশীলতার তীব্রতাকে মুছে ফেলতে।[১৮] অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, নগরায়ণ, পারিবারিক গঠনরীতির পরিবর্তন (Joint family to neculear family[১৯]), সাংবিধানিক সমঅধিকারবোধ, নিজস্ব আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি নারীর পারিবারিক দায়িত্ব ও ভূমিকা বদল মধ্যবিত্ত বাঙালিনীকে ঘরের বাইরে বের করে এনেছে এবং নিযুক্ত করেছে উপার্জনভিত্তিক চাকরির জগতে; যা সমকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছিল এক আমূল পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমাজতাত্ত্বিকের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য—

> Educated Middle-class Women's taking up out of home gainful employment has significant implication for social change.[২০]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও পুরোনো রক্ষণশীলতার কাঁটাতারকে ছিন্ন করে পারিবারিক ও আত্মিক বিকাশের তাগিদে বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ- পরবর্তী সময়পর্বের মধ্যবিত্ত বাঙালিনীর চাকরিস্থলে প্রবেশের পথকে সম্পূর্ণরূপে কন্টকমুক্ত ও প্রশস্ত করে তুলেছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক মুক্তকণ্ঠে তাই বলতে পারেন—

> মেয়েদের চাকরি করা তো এখন জলভাত, শিক্ষাদীক্ষাতেও তাঁরা পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম নন,...[২১]

দেশভাগ ও দেশত্যাগ পরবর্তী বিপন্ন যুগজীবনে বাঙালি মধ্যবিত্তের পূর্ববর্তী সামাজিক চালচিত্র বদলে গেছে। বদলে গেছে, নারী-পুরুষের অধিকারের প্যারাডক্স। পরিবারকে আর্থিক অনটনের করালগ্রাস থেকে রক্ষার জন্য পুরোনো ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে এসে মেয়েরা ঝাঁপ দিয়েছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের রৌদ্রঢালা পথে। সংসারের প্রয়োজন মেটাতে চাকরি খুঁজে নিয়েছিল স্কুল, কলেজ কিংবা বিভিন্ন অফিসে। ট্রামে, বাসে বেড়েছিল মেয়েদের

---

১৮ মধুমিতা আচার্য, পূর্বোক্ত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, পৃ. ১১

১৯ Towards Equality, Report of Committee on the Status of Women in India, p. 148. - দ্র. সোহিনী সিনহা, পূর্বোক্ত চাকুরিজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা (উনিশ থেকে বিশ শতক), পৃ. ৫৭

২০ Pramila Kapur, Changing status of working women in India, Vikash Publication House, New Delhi-44, First Edition: 1974, p. 60.

২১ সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গল্প উপন্যাসে বাঙালিনী নিজেকেই দেখতে চান, পূর্বোক্ত দেশ, পৃ. ৪০

সংখ্যাও।[২২] সময়ের এই পরিবর্তন বা বিবর্তনের ফলে নারীদের চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশ ও কর্মজীবনের বর্ণময় চালচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা প্রভূত গল্পকারদের লেখনীতে। আসলে প্রতিটি লেখকের 'রচনাকর্মের মধ্য থেকে দেশ-কাল-পাত্রের সামগ্রিক পরিচয়টি উপস্থিত হয়।'[২৩] স্মরণীয় সেই গল্পকারদের অন্যতম দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯)। নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের 'অলিতে-গলিতে' (বিভিন্ন সময়ে) ছিল এই গল্পকারের অবাধ বিচরণ। সেহেতু শহুরে মধ্যবিত্তের সদর-অন্দরের বিভিন্ন ছবির মতো চাকুরিক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালিনীর প্রবেশ, চাকুরিজীবন ও পারিবারিক জীবনে চাকুরির প্রতিক্রিয়ার সার্থক ও অনাবৃত চিত্রটি তাঁর ছোটগল্পে আন্তরিকতার সঙ্গে সহজ-সরল কথনশৈলীর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত। গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের গল্প-বিশ্বে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের চাকুরিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং চাকুরিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক জীবনের আবর্তন কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তা আমাদের এই অধ্যায়ের অন্বিষ্ট। তবে, আলোচনার পূর্বে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের গল্পকার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তকে সংক্ষেপে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় দিব্যেন্দু পালিত এক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগানো নাম। পঞ্চাশের দশকের সূচনালগ্নে আবির্ভূত এই গল্পকারের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৫ মার্চ। বিহারের ভাগলপুর শহরে।[২৪] জন্মসূত্রে 'ভাগলপুরী'[২৫] হলেও দিব্যেন্দু নিজের লেখকসত্তাকে লালনপালন ও সমৃদ্ধ করেছেন নগর কলকাতার অলিন্দে বসে। ফলস্বরূপ, তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়– কর্মব্যস্ত কলকাতা, নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষ এবং তাদের দ্বন্দ্বময়, কোলাহলপূর্ণ প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্র। তাই তাঁর গল্পে আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য সম্পর্কের নানা জটিলতা, নৈতিক অবক্ষয়ের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকে আর্থিক সচ্ছলতাদানের জন্য বা স্বনির্ভরতার 'নতুন-স্বাদের' আকাঙ্ক্ষায় মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর কর্মক্ষেত্রে পদার্পণের প্রতিচ্ছবিও বিশেষভাবে রূপলাভ করেছে–

---

২২ সোহিনী সিনহা, পূর্বোক্ত চাকুরিজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা (উনিশ থেকে বিশ শতক), পৃ. ৪০

২৩ সমালোচক সত্য গুহ তাঁর 'বাংলা উপন্যাস-গল্পে পঞ্চাশের সপ্তর্ষি' (নহবৎ, শারদ সংকলন : ১৩৮৪) প্রবন্ধে এরূপ মন্তব্য করেছেন। - দ্র. অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৮

২৪ 'পৃথিবীর মানুষের পারম্পর্যহীন জন্মলাভের ধারাবাহিকতায় এক অতি সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম; আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে (১৯৩৯-এ); বিহারের ভাগলপুর শহরে।' - দ্র. দিব্যেন্দু পালিত, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৩

২৫ 'শীর্ষেন্দুর মতন আর এক ইন্দুর সঙ্গ জুটেছিল আমার ভাগ্যে। তার নাম দিব্যেন্দু। আমরা কখনো ঠাট্টা করে ডাকতাম পালিতসাহেব, কখনও বা বলতাম ভাগলপুরী।' - দ্র. বিমল কর, আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯২, পৃ. ৩৩

> দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ... জীবনের, এই শ্রেণীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের, এমন সব গলিঘুঁজির সন্ধান রাখেন এমন দুর্লভ এবং তীক্ষ্ম সংবেদনে সেগুলিকে গোচরে আনেন যে, অন্য জনপ্রিয় লেখকের অনেকের লেখায় তা আমরা সচরাচর পাই না। দিব্যেন্দু আমাদের অস্তিত্বের চেনা অংশটাই আমাদের দেখান ... যে, আমাদের চেনা আরো গভীর হয়।[২৬]

আধুনিক নাগরিক জীবনের 'সদর-অন্দরের' চালচিত্রের পাশাপাশি দেশভাগের ফলে শিকড়হীন ক্ষুধার্ত মানুষের আশ্রয়হীনতার করুণ রূপ, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ, নকশাল আন্দোলন অধ্যুষিত কলকাতার হিমাবহ, খেলা ও খেলোয়াড়, শ্রমিক আন্দোলন, ক্ষুধা, হ্রস্বস্বরিত ইতিমূলক প্রতিবাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলিও হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পের বিষয়-আশয়।

সময়টা ৩০ জানুয়ারি ১৯৫৫। আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' ক্রোড়পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম গল্প। নাম– 'ছন্দ-পতন'।[২৭] তখনো তাঁর বয়স ষোলো বছর পূর্ণ হয় নি, ভাগলপুরে কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার পরের বছরেই সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গল্প– 'নিয়ম'। লেখকের নিজের মুখেই ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশের বৃত্তান্ত–

> আমি যখন কলজের দ্বিতীয় বর্ষে, ১৯৫৫ সনে, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমার প্রথম গল্প 'ছন্দ-পতন'। যতোদূর মনে পড়ে, সেদিন ছিল ৩০ জানুয়ারি। বিবাহিত দুই বোনের সুখ-দুঃখ নিয়ে সাদামাটা গল্প– ডাকে পাঠিয়েছিলাম সম্পাদকের দপ্তরে, ছাপা হবে আশা করি নি। তবু ছাপা হল। বোধহয় এর পরের গল্পটির নাম 'নিয়ম', ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়।[২৮]

কৌশোরের উন্মুখ সাহিত্য পিপাসা নিয়ে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় সেই সময়েই বেশ কিছু গল্প আর একটি উপন্যাস (সিন্ধু বারোয়াঁ) লিখে ফেলেছিলেন দিব্যেন্দু। কিছু পরে প্রকাশ করেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে'। প্রেম-অপ্রেম এবং তার বৈধ-অবৈধ সম্পর্কের বিষয় কিংবা কাহিনি নির্মাণে নতুনত্ব ছিল না, ছিল বই ছাপানোর একান্ত আগ্রহ।[২৯] পিতৃবিয়োগের পর ১৯৫৮ সালে প্রায় নিঃস্ব, অসহায় দিব্যেন্দুর কলকাতায় আগমন। শান্ত

---

২৬ পবিত্র সরকার, মধ্যবিত্তের মহাকাব্য, আজকাল, ৩ জুলাই, ১৯৯৪। - দ্র. দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৫, প্রাসঙ্গিক কথা, পৃ. ৪৭৩

২৭ তদেব

২৮ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, পৃ. ৯৯

২৯ শ্রাবণী পাল, সম্পর্কের টানাপোড়েন : দিব্যেন্দুর অনুভব, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), পঞ্চাশের দশকের কথাকার, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২৯৭

নিস্তরঙ্গ মফস্বল ছেড়ে কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনে পদার্পণের পর শুধু তাঁর জীবনধারারই পরিবর্তন ঘটল না, সেই সঙ্গে জীবনের অর্থও বদলাতে শুরু করে। ফলে অতীতস্মৃতি নয়, কলকাতার বহুমুখী সংগ্রাম এবং জটিল ঘূর্ণাবর্তপূর্ণ সমকালীন মহানগরের জীবনচর্যা হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের মৌল উপাদান। কারণ, 'লেখককে গড়ে তোলে তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা পরিশীলিত হয় তার অনুভূতি ও বোধের মধ্য দিয়ে– এসবের মধ্য দিয়েই আসে তার সম্পূর্ণতা।'[৩০]

দিব্যেন্দু পালিত স্বয়ং নিজের 'গল্প-জীবন'কে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্ব : ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫। দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৬৫-এর পরবর্তী সময়পর্ব। লেখকের কথায়–

> সূচনার দিন থেকে এ-পর্যন্ত আমি যা লিখেছি, তাকে পরিষ্কারভাবে ভাগ করা যায় দুটি পর্বে– ১৯৬৪-৬৫-এর আগে এবং ওই সময়ের পরে।[৩১]

প্রায় প্রত্যেক লেখকই সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রস্তুতিহীন, অপরিণত মন নিয়ে রচনা করেন তাঁদের সাহিত্য। গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত তার ব্যতিক্রম নন। সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতিপর্বে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়–

> সত্যি বলতে, প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে যখন আমি হঠাৎ লেখা শুরু করি, গোড়ার দিকের সেইসব রচনায় শুধু সুবোধ ঘোষ কেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবও কম ছিল না; পরবর্তীকালে প্রায় এককভাবে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বিমল কর।[৩২]

তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই দিব্যেন্দু অন্যের ব্যবহৃত পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাকটিকে চিনে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজস্ব অভিজ্ঞতানির্ভর সত্তা, পরিণত মন, মার্জিত-ঝকঝকে মেদহীন কাব্যময়[৩৩] গদ্য নিয়ে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত হয়ে উঠেছেন সমসাময়িকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৩০ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, পৃ. ১০২

৩১ তদেব, পৃ. ১০০

৩২ তদেব, পৃ. ৯৯-১০০

৩৩ দিব্যেন্দু পালিত কেবলমাত্র কথাসাহিত্যিক বা প্রাবন্ধিক নন, একজন বড় মাপের কবিও। নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় স্বীকার করেছেন– তাঁর 'কবিতা লিখতে সবচেয়ে ভালো লাগে।' সুতরাং তার ভাষা কিছুটা কাব্যময়, সুরেলা হওয়া স্বাভাবিক। - দ্র. বিমল কর, পূর্বোক্ত আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, পৃ. ৩৭

নাগরিক জীবনের জটিলতা অনেক বেশি। নগরজীবনের অন্তঃস্থলের উদ্বেগকে স্পর্শ করতে না পারলে কোনো লেখা প্রকৃত নাগরিক সত্যকে চিনিয়ে দিতে পারে না।[৩৪] কিন্তু গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত নিজের লেখক-সত্তাকে প্রায় আজীবন 'নাগরিক পরিবেশ'-এ লালন করায় নাগরিক মধ্যবিত্ত মন, মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেই নাগরিক মন ও সমাজের যে নিঃশব্দ পালাবদল ঘটেছে তার একটি দৃশ্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ফলে, বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি সমকালীন মর্মন্তুদ আর্থসামাজিক আবহের করালগ্রাস থেকে নিজেদের পরিবারকে রক্ষার্থে, ব্যক্তিস্বার্থ বা আত্মমর্যাদাবোধের তাগিদে কিংবা আরো বিবিধ কারণে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর 'কর্মসংস্কৃতি'-র সঙ্গে মেলবন্ধন এবং সেই মেলবন্ধনের সূত্রে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দুর গল্পের অন্যতম একটি বিষয়। তাঁর 'মাছ' (ভারতবর্ষ, ১৩৬৪) গল্পটি এই ঘরানার অন্যতম শরিক।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক– উভয়ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষিত এবং 'নোবল জব'[৩৫] রূপে বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষকতা মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর কাছে আদরণীয় একটি পেশা। অনেক সময় সে কারণে মধ্যবিত্ত মেয়েরা শিক্ষকতা দিয়েই তাদের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের দর্পণে তার পরিচয় মেলে। দিব্যেন্দু পালিতের 'মাছ' গল্পের নায়িকা নিরুপমা একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। গল্পের শুরুতেই কথকের মুখে তার চাকুরিক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়–

> স্কুল কম্পাউন্ডের ভিতর থেকে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এল নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুলোট গরম হাওয়ার অভ্যর্থনা পেল; চোখের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল একরাশ ধুলো। ...মেয়েদের হোমটাস্কের খাতাগুলো হাত-বদল করল নিরুপমা; হাতের ছাতাটা খুলতে গিয়ে খুলল না।[৩৬]

শ্রমিক ধর্মঘট পরিচালনা করতে গিয়ে ফ্যাক্টরির মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্রে সংসারকে মাথায় করে রাখা নিরুপমার দাদা খুন হওয়ার পর বেসরকারি অফিসের কেরানি পিতার আয়ের ওপর নির্ভর করে 'ধুকতে ধুকতে' চলে নিদারুণ অভাবপীড়িত এক মধ্যবিত্তের সংসার। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আর্থিক রদবদলের ফলে পিতার স্বল্প বেতনে সম্পূর্ণ পরিবার নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় শিক্ষিত নিরুপমা আর্থিক সচ্ছলতার তাগিদে অনেকদিনের লালন করা উচ্চশিক্ষার মধুর স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে বাধ্য হয়ে চাকুরির জগতে এসেছে। এবং গ্রহণ করেছে মেয়েদের স্কুলে

---

৩৪ অমর মিত্র, তিনি আমাদেরই লেখক, প্রদীপ্ত রায় (সম্পাদিত), প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ : ২০০৩, পৃ. ৪৭

৩৫ মধুমিতা আচার্য, পূর্বোক্ত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, পৃ. ১৯

৩৬ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৪০

রুটিন বাঁধা শিক্ষকতার কাজ। পিতার স্বল্প আয়ের পর তার স্কুলের বেতন সংসারে এনে দিয়েছে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার ছায়া–

> স্কুলের এই ষাট টাকা মাইনের চাকরিটার খবর দিয়েছিলেন বাবার এক বন্ধু। বিয়ে হচ্ছে না এবং খুব তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে হয় না; তখন শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। মাসের শেষে ষাটটা টাকা ঘরে তুললে সংসারের অনেক সুবিধে হবে।[৩৭]

শুধু তাই নয়, অধিক আর্থিক সুবিধার জন্য শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে টিউশনির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। লেখকের কথায়– 'সেই কোন সকাল পাঁচটায় বেরিয়েছে বাড়ি থেকে... বোসপাড়ায় একটি মেয়েকে পড়াতে হয়।... ছাত্রী পড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্কুলে ছোটা। হেডমিস্ট্রেস মিস মল্লিক টিচারদের দেরি করে আসা পছন্দ করেন না।[৩৮]

মেয়ের বিয়ে হোক সাধারণ মায়ের মতো নিরুপমার মা-ও চায়। নিরুপমারও ইচ্ছে স্বনির্বাচিত প্রেমিক-পুরুষ বিজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার (বিজন) বুকে মাছরাঙার মতো ঝাপিয়ে পড়তে। কারণ, সেখানে রয়েছে শুধু সুখ আর নিরাপত্তা! কিন্তু মেয়ের বিয়ের আড়ালে মায়ের মনে কাজ করে যায় নিরাপত্তাহীনতার এক অব্যক্ত আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক 'গোটা মাছটা একা গিলবি তো বাকিগুলা খাবা কি...'[৩৯] বলে উদ্বাস্তু সংসারে এক বুভুক্ষু জীর্ণ সন্তানের গলাটিপে মুখ থেকে মাছ ছিনিয়ে নেওয়া রাক্ষসী প্রৌঢ় মায়ের কর্মকাণ্ড দর্শনের পরে ছায়া থমথমে শুকুনের ডানায় ভর করা রাত্রিতে নিরুপমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবং অনুভব করেছে সংসারের দুই তরফের আক্রমণে নিজের মৎসায়িত রূপটি। ফলস্বরূপ, প্রণয়াস্পদের বুকে মাছরাঙা হয়ে ঝাপিয়ে পড়ার সাধ ও সাধ্যকে ভেঙে দিয়ে শিকড়ের টানে পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গকে বড় করে দেখেছে এবং বিজনের সঙ্গে ভ্রমণের সীমা দ্রুত টেনে মায়ের কাছে নিষ্প্রাণ গলায় অনুরোধ করে– 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারবো না।'[৪০] চাকুরিজীবী নিরুপমার চাকুরিকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের ক্রমশ সচ্ছল হয়ে ওঠা এবং সচ্ছলতা অটুট রাখার জন্যে নিজের 'সখ-আহ্লাদ'কে বিসর্জন ও আত্মদ্বন্দ্বের ইতিবৃত্তকে দিব্যেন্দু পালিত এই গল্পে নির্মেদ গদ্যে নিপুণভাবে ব্যক্ত

---

৩৭ তদেব, পৃ. ৪৩

৩৮ তদেব, পৃ. ৪০

৩৯ তদেব, পৃ. ৪৬

৪০ তদেব, পৃ. ৪৭

করেছেন। গল্পটি ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমাকে মনে করিয়ে দেয়। 'মাছ' অবশ্য ঋত্বিকের ছবির অনেক আগে লেখা।[৪১]

'বাড়ি' (রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৭০) গল্পটিতেও এক স্কুলশিক্ষিকার দেখা মেলে। নাম– মিনতি। লেখকের ভাবনায় তার পরিচয় এরূপ– 'মিনতি থাকে মনসাতলা বাই লেনে, মিনতির বাবা অ্যালোপ্যাথি পাশ না-করা একজন হোমিওপ্যাথ। আর, মিনতি একটা স্কুলে পড়ায়।'[৪২] সে যাকে বিবাহ করবে, সেই প্রেমিক-পুরুষ প্রকাশও একটি কোম্পানির কর্মচারী। বিয়ে করার জন্য প্রয়োজন আশ্রয়ের; আর তার জন্য বিজ্ঞাপন দেখে কিংবা দালালের হাত ধরে শুরু হয় তাদের বাড়ি ভাড়া খোঁজার কাজ। বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে শহর কলকাতায় সাত-আটশো টাকার নিচে মধ্যবিত্ত সুলভ বাড়ি ভাড়া পাওয়া অসম্ভব।[৪৩] কিন্তু মধ্যবিত্তীয় মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে ভাবী দম্পত্তির তেমন ঘরই প্রয়োজন। আঁকাড়া নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে একরকম আবেগের পাখায় ভাররত প্রকাশ বিবাহপরবর্তী সময়ে মিনতিকে চাকুরি করতে না দেওয়ার জন্য মনস্থির করলেও; বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে সেসব ইচ্ছা। তাই বিবাহপরবর্তী জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার নির্বাহ এবং আর্থিক তাগিদে খুব বিনয়ের সঙ্গে মিনতি বলে–

> সাত আটশোর কমে একটা ঘর পাওয়া যায় না। মাইনের ওয়ান থার্ড যদি বাড়ি ভাড়াতেই যায় তাহলে খাব কী!... অবশ্য তুমি যদি চাকরিটা রাখো তাহলে কিছুটা সুরাহা হয়– [৪৪]

প্রাক্-দেশভাগ পর্বে লিখিত বেশ কিছু গল্পকারের গল্পে ('পেশা', 'মলাটের রঙ', 'কুলফি বরফ', 'অবতরণিকা' প্রভৃতি) নারীর চাকুরি জগতে প্রবেশের পথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাধারূপে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সূক্ষ্ম রক্ষণশীলতার ছবি চোখে পড়ে। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে তা একেবারে লীন। সময়ই তাঁকে এরূপ প্রেরণা দিয়েছে। 'বাড়ি' গল্পে বিবাহপরবর্তী জীবনে প্রকাশের ভাবী স্ত্রী মিনতিকে চাকুরি করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত রক্ষণশীলতা হেতু নয়, সেখানে প্রেমিকাকে খুশি করার তাগিদই ছিল মুখ্য। সে কারণে প্রকাশ পরে মিনতিকে চাকুরিটা রাখার জন্য 'মিনতি' করেছে। সে অবহিত যে, সমকালীন ভয়াবহ সময়পর্বে নিজের রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে মিনতির চাকুরিই আর্থিক দুর্বলতার বিষ নিঃশ্বাস থেকে মুক্তির একমাত্র

---

৪১ বিষ্ণু বসু: সুখ-দুঃখের স্মৃতি, কিছু অপমান বোধ : দিব্যেন্দু পালিতের গল্প, সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), বাংলা গল্প ও গল্পকার-৪, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০১০, পৃ. ৫২

৪২ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৯৮

৪৩ তদেব, পৃ. ৯৯

৪৪ তদেব

চাবিকাঠি। বিশ শতকের শেষের দিকে কোনো রক্ষণশীলতা নয়, নিজেদের মধুর-সুখী জীবনের জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মেয়েরা মিনতির মতো ক্রমশ ট্রামে, বাসে চড়ে চাকুরিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে মেতে উঠেছে। ফলে নারীর অধিকার ও সম্মানের রেটিং সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং ক্রমশ ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর হয়েছে। প্রকাশের ভাবনায় তার পরিচয় মেলে– 'বিয়ের বাজারে চাকরি-করা মেয়েদের রেটিং আলাদা।'[৪৫]

দিব্যেন্দুর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় গল্প 'নিয়ম' (দেশ, ১৩৬২)। এই গল্পের নায়িকা– মিস স্বপ্না রায়। লেডিস কলেজের বাংলার প্রফেসর। গল্পের প্রথমেই 'লেখক-কথনে' পাঠক অবগত হয়েছে বাংলার অধ্যাপক মিস রায় কর্তৃক ছাত্রীদের প্রতি শিষ্টাচারবিধি সম্বন্ধীয় সুশ্রাব্য ভাষণ সম্পর্কে–

> ক্লান্ত পশুর মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে সহসা চিৎকার করে উঠেছিল দুপুরের শেষ লোক্যালটা। সেই তীক্ষ্ম শব্দ শুনে ভয় পেয়ে আকাশে ডানা মেলেছিল এবং উড়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে মেয়ে কলেজের সম্মুখে টেলিগ্রাফের তারে বসেছিল সাঁকোর উপর বসে-থাকা বন্ধ-চক্ষু মাছরাঙাটা। তখন মেয়ে কলেজের একটা কক্ষে এটিকেট সম্বন্ধে সুশ্রাব্য ভাষণ দিচ্ছিলেন বাংলার প্রফেসর মিস রায়।[৪৬]

গল্পটিতে লেখক স্বপ্না রায়ের পারিবারিক মানচিত্র অঙ্কন করেন নি। চাকুরি ও সুশ্রীরূপের গুণে তার আভিজাত নারী হয়ে ওঠার এবং সেই আভিজাত্য, ব্যক্তিত্বের সূত্র ধরে ধনী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উদ্দালক বসুকে নিজের করায়ত্তে আনা ও 'অদ্ভুত সুন্দর জীবন' উপভোগের প্রতিচ্ছবিটি অঙ্কিত। মেয়ে মানে লজ্জাশীলা, ত্যাগের প্রতিমূর্তি, সহিষ্ণুতার প্রতীক এমন কিছু চিত্র বাঙালি মানসে স্থাপিত ছিল।[৪৭] কিন্তু দিব্যেন্দুর মিস স্বপ্না রায় এই 'ভাবনা'কে ভেঙে দিয়ে চার দেওয়ালের বাইরে চাকুরিকে অবলম্বন করে নির্মাণ করেছে আত্মপরিচয়। এবং সেই আত্মপরিচয় ও শরীরকে অবলম্বন করে মধ্যবিত্ত এই নারী নিজেকে সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে।

ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির সংক্ষুব্ধ প্রত্যক্ষ প্রখর উত্তাপে ষাট ও সত্তরের দশক বিপর্যস্ত।[৪৮] কলকারখানায় নতুন অর্থনৈতিক সংকটজনিত কারণে বাড়তে থাকে ছাঁটাই, শ্রমিক আন্দোলন এবং পরিণামে কারখানার নোটিশ বোর্ডে লিখিত হয়– লে-অফ,

---

৪৫ তদেব, পৃ. ৯৮

৪৬ তদেব, পৃ. ১৯

৪৭ মউলি মিশ্র, ক্লাসরুম থেকে ক্যাটওয়াক : এই মুহূর্তে বাঙালিনী, পূর্বোক্ত দেশ, পৃ. ২৪

৪৮ অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২, পৃ. ব্লার্ব অংশ

লক-আউটের মতো কিছু হৃদয়বিদারক শব্দবন্ধ। এক কিশোরীর জবানিতে রচিত দিব্যেন্দু পালিতের আবেদনে গভীর 'বাবা' (শারদীয়া পরিবর্তন, ১৩৯১) গল্পটিতে এই অভিঘাত লক্ষ করা যায়। বাবার কারখানায় মাস চার-পাঁচ ধরে লক-আউট হওয়ায় মার চাকুরিকে অবলম্বন করে চলে মধ্যবিত্তের সে সংসার। চাকুরির নির্দিষ্ট বেতনে পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর না হলে; মা ঘড়ি-বাঁধা দৈনিক কাজের পরেও 'ওভার টাইম' কাজ করে। মেয়ের ভাবনায় 'ওভার টাইম'-এর যথার্থতা ধরা না পড়লেও, মায়ের কর্মজীবনের কষ্ট-কাতরতা অনুভূত হয়—

> মার ফিরতে এখন অনেক দেরি। তাছাড়া, মা'র আজকাল ফিরতে দেরিও হয় কোনও কোনও দিন। ওভার টাইম না কী যেন করে অফিসে।[৪৯]

উপার্জন কম হওয়া সত্ত্বেও সেই অর্থকে অবলম্বন করে মা মেয়ে ও ছেলেকে বড় স্কুলে ভর্তি করেছে। এবং সম্পর্কের তিক্ততা সত্ত্বেও চাকুরিকে অবলম্বন করে সংসারকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ভবিষ্যতের দিকে। মা-এর চাকুরি না থাকলে সংসারের কী হতো? এর উত্তর ছোট্ট মেয়ের ভাবনায় মেলে না। সংসারের প্রাত্যহিক যন্ত্রণাবোধ, অসহায়তা ও হীনম্মন্যতার মায়াজাল শেষপর্যন্ত বাবাকে মৃত্যুর জগতে নিয়ে গেলেও; মা তার চাকুরি ও দুই সন্তানকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অর্থাৎ চাকুরিই মাকে জুগিয়েছে বাবাহীন পরিবারে বেঁচে থাকার খোরাক। গল্পকার বাবার মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথাকে গল্পে নিয়ে আসেন নি, তবে কৌশলে মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর স্বামীহীন পরিবারে চাকুরিকে দোসর করে জীবন অতিবাহনের প্রসঙ্গকে ব্যঞ্জিত করেছেন।

নাগরিক মন সতত অসহিষ্ণু এবং আত্মকেন্দ্রিক। আত্মসুখকে বিসর্জন দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধানে তারা নারাজ, স্পর্শকাতর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার সমাধানের ক্ষেত্রেও নয়। তাই অনেক সময় সমস্যামুক্ত, সুখী জীবনের আশার কেরিয়ারিস্ট স্বামী-স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদকে শ্রেয় বলে মনে করে। দিব্যেন্দু পালিতের 'কখন অন্যমনে' (পার্বণী সানন্দা, ১৪০৩) গল্পের স্বামী-স্ত্রী কুন্তল ও অপর্ণা তার অন্যতম সাক্ষ্য। অপর্ণা বড় বেশি কেরিয়ার-কেন্দ্রিক হওয়ায় স্বামী কুন্তলের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় এবং মনোমালিন্যের সূত্র ধরে কোর্টে সম্পন্ন হয়েছে ডিভোর্স ফাইলের কাজ—

> কোর্টে ডিভোর্স ফাইল থ্রু হওয়ার পরের দিনই সে হেয়ার-ড্রেসারের দোকানে গিয়ে চুলের সঙ্গে সিঁথিটাও ধুয়ে ফেলেছিল পুরো।[৫০]

---

৪৯ দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র-২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৭৪

৫০ তদেব, পৃ. ৫১৪

অপর্ণা রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক। সুতরাং তার আর্থিক স্বাধীনতা রয়েছে, রয়েছে পায়ের তলার মাটি। এই আর্থিক স্বাবলম্বন অর্থাৎ চাকুরির জোরেই স্বামীর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কে না থেকে সুখান্বেষী মন নিয়ে ডিভোর্সের সম্মুখীন হয়েছে। চাকুরি না থাকলে এরূপ সিদ্ধান্ত তার পক্ষে স্বপ্নলোকের কল্পনামাত্র। স্বামীর সঙ্গে সেপারেশনের পরে ফ্ল্যাটের ভাড়া পুরো দিতে হবে ভেবে চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আর্থিক সংস্থানের তাগিদে টিউশনিও নিয়েছে– 'কুন্তলের সঙ্গে সেপারেশন হওয়ার পর থেকে ভাড়ার টাকাটা গুনতে হচ্ছে তাকে। বাড়তি রোজগারের জন্যে শনি রবি দুদিন আটজন ছাত্রীকে গানের ট্যুইশন দেয় বাড়িতে।'[৫১] শুধু তাই নয়, দেশে-বিদেশে একাধিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে গানকে অবলম্বন করে আর্থিক সচ্ছলতা যেমন পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে বড় বড় শিল্পীর প্রশংসাও। লেখকের মুখে তার পরিচয় মেলে–

> রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন, শান্তিনিকেতনে মোহরদির কাছে আপনার প্রশংসা শুনেছিলাম। আজ বুঝলাম কেন![৫২]

আরো আরো টাকা এবং প্রশংসা অপর্ণাকে ক্রমশ প্রখরভাবে কেরিয়ারিস্ট করে তুলেছে। এবং স্বামীর কাছে হয়ে উঠেছে একজন জনপ্রিয় 'কেরিয়ার গার্ল'।[৫৩]

অর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের লালসায় মাত্রাতিরিক্ত কেরিয়ারিস্ট হয়ে ওঠার ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিনী অপর্ণার স্পর্শকাতর দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষয়িষ্ণু রূপের পাশাপাশি চাকুরি ও ছেলে রঙ্গনকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার ইতিবৃত্তকে গল্পকার এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্বেচ্ছাধীন পেশা (গায়িকা)-কে অবলম্বন করে মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধিকারবোধ অর্জনের প্রসঙ্গকেও দিব্যেন্দু ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। 'গাঢ় নিরুদ্দেশে' (শারদীয় দেশ, ১৩৯৩) গল্পের নীপা চরিত্রের মধ্যে তার সাক্ষর বর্তমান।

'সম্পর্ক' গল্পের দোলা স্কুলের শিক্ষিকা এবং প্রথম শ্রেণির একজন অভিনেত্রী– "'দৃশ্যরূপ' নাট্যদলে এখন সে অঞ্জনার পরেই, দু নম্বর অভিনেত্রী। এ ছাড়াও তিন-চার মাস হল সে কাজ পেতে শুরু করেছে টিভি সিরিয়ালে।... তার আগে স্কুলের... কাজটাও বাদ দেওয়া যাবে না।"[৫৪] স্বামী দেবাঞ্জন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ব্যাঙ্কের চাকুরিই তার প্রধান অবলম্বন। ম্যানেজমেন্টের খেয়ালখুশিতে গোরক্ষপুরের নতুন ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার অর্ডার আসায়, সেখানে চলে

---

৫১ তদেব, পৃ. ৫০৫

৫২ তদেব, পৃ. ৫১৪

৫৩ তদেব, পৃ. ৫১১

৫৪ দিব্যেন্দু পালিত, সম্পর্ক, বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ২

যেতে হবে। কিন্তু স্ত্রী দোলা তার অভিনয় জগৎ এবং শিক্ষকতাকে উপেক্ষা করে স্বামীর সঙ্গ নেয় নি; বরং বলে– 'না, যাব না।'[৫৫] ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবেশ করে মনোমালিন্য। তবে এই সমস্যার সমাধানের পথে সে পা ফেলে নি; আর্থিক স্বাবলম্বন চাকুরি এবং অভিনয় জগতের খ্যাতিকে আঁকড়ে ধরে স্বামীর অবর্তমানে নগর কলকাতার অলিন্দে জীবনযাপনের পরিকল্পনা করে। দোলার ভাবনা জগতে তার পরিচয় পাওয়া যায়– 'না ভেবে পারল না দোলা, দিনকাল পাল্টেছে, এখন সে কিছুটা স্বাবলম্বী এবং কাজকর্ম ও সে সবের দায়িত্ব আছে বলেই দেবাঞ্জনকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবছে।'[৫৬] স্ত্রী কিংবা নারীত্বের পরিচয় নয়, দোলা জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও শিক্ষকের সম্মানজনক পরিচয়কে শেষ পর্যন্ত দোসর করেছে। এবং স্বামীর অপমানকে শিরোধার্য না করে ব্যক্তিত্বময়ী নারীর মতো হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ মুখর– 'দেবাঞ্জন তার স্বামী হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যা-ইচ্ছে তাই করবে, যা-ইচ্ছে তা-ই বলবে।'[৫৭] চাকুরি এবং উপার্জনভিত্তিক কোনো পেশা মধ্যবিত্ত বাঙালিনীর মানসজগতের রূপান্তর ঘটিয়ে আরো বেশি আত্মসুখান্বেষী ও সবলা করে তোলে দিব্যেন্দুর দোলা তার সাক্ষ্য। তবে আত্মসুখ, স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় কিংবা সুনামই কি জীবনের সব? দাম্পত্য সম্পর্কের মধুরতা কি সত্যিই নাগরিক জীবনে এতটা উপেক্ষিত? এরূপ শত প্রশ্ন পাঠক ছুড়ে দেয় গল্পকারের প্রতি; এমনকি দোলারূপী চাকুরিজীবী নাগরিক বাঙালি নারীর প্রতিও।

শিক্ষকতার পাশাপাশি অফিসকর্মী নারীর দেখা মেলে দিব্যেন্দুর গল্প-ভুবনে; 'সিঁড়ি' (শারদীয়া অমৃত, ১৩৮৬) গল্পটি তার অন্যতম উদাহরণ। গল্পটিতে গল্পকার বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের নারী নীলাকে স্থাপন করেছেন অন্যমাত্রা দিয়ে। স্বামী অসীম (মস্ত কোম্পানির কেরানি) ও সাত বছরের কন্যা টিনাকে নিয়ে তার সংসার। নীলা কমিউনিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্বামী কিছু না বললেও পুরোনো বেতের চেয়ার পরিত্যাগ করে সে নিজের প্রমোশনের টাকায় 'ছিমছাম স্টাইলের' সোফাসেট ক্রয় করে এনে নাগরিক মধ্যবিত্তের মর্যাদাকে বজায় রেখেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য– 'রেট্রসপেক্টিভ এফেক্টে প্রমোশন পেয়ে বাড়তি হাজার ছয়েক টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাউকে কিছু না বলে সোফা সেট কিনে আনে। অসীম প্রশংসা করেছিল, কিন্তু খুশি হয়েছিল কিনা বোঝা যায়নি।'[৫৮] টাকার সঙ্গে বিলাসের সংযোগ অবধারিত।[৫৯] সেই বিলাস তথা আর্থক্রীত স্বাচ্ছন্দ্যকে পূরণের চাহিদা নীলা স্বামীর কাছে পেশ করে নি। বরং নিজের চাকুরি এবং উপার্জিত অর্থকে

---

৫৫ তদেব, পৃ. ৩

৫৬ তদেব, পৃ. ৫

৫৭ তদেব, পৃ. ১৬

৫৮ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-২, পৃ. ১৫

৫৯ সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১২, পৃ. ৩৫৯

অবলম্বন করে তা পূরণ করেছে। স্বামীর নিকট কোনো চাহিদা পেশ না করায় অসীম নিঃস্পৃহ হয়ে থাকে, মন হয়ে ওঠে কিছুটা কমপ্লেক্স।

স্মার্ট, ব্যাচেলর শ্যামলেন্দু নীলার অফিসের বস। নীলা চাকুরিতে উন্নতি চায়; সেই পথের নিয়ন্ত্রণ শ্যামলেন্দুর হাতে। চাকুরিক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অসীমের বিরাগ নীলাকে ঠেলে দেয় শ্যামলেন্দুর ভোগের বৃত্তে। অর্থাৎ আধুনিককালের নগরায়ণের উৎপাদন এই নারী চরিত্র নীলা কর্মক্ষেত্রে উচ্চাশার জন্য নিজের নৈতিকতা বা সংস্কারকে ধরে রাখতে পারে নি। বসের মন রাখতে কখনো আঁচল উড়িয়ে একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে অফিসে গেছে, কখনোবা বসের শরীরী চাহিদা পূরণের তাগিদে উঠে এসেছে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে–

> 'কাল আসতে পারবে না আগেই বলেছ। আজ পারবে?' নীলা জবাব দিল না। অ্যাটাচিটা হাতে তুলে নিল শ্যামলেন্দু, হাতটা আবার এগিয়ে দিল নীলার পিঠে। 'চলো, বেড়িয়ে পড়া যাক।' শ্যামলেন্দু এগিয়ে গেল। নীলা দেখল যে শ্যামলেন্দুকে অনুসরণ করছে। এই ভাল। গাড়ির সিটে ভারী ঘাড়টা যতটা সম্ভব এলিয়ে দিয়ে নীলা ভাবল, এই যাওয়াটায় ভুল নেই কোনও। উচ্চাশা তাকে অনেক দিয়েছে... হয়তো এবার সে আরও এক ধাপ উঠবে।[৬০]

কখনো সংস্কার ভেঙে হাতে ঠান্ডা বিয়ারের গ্লাস তুলে মেতে উঠেছে 'চিয়ার্স' নামক শব্দটির সঙ্গে। কেরিয়ারিস্ট স্ত্রীর এরূপ জীবনচর্যা অসীম মেনে নিতে পারে নি বলেই চির ধরেছে দাম্পত্য সম্পর্কে। কিন্তু নাগরিক এই নারীর কাছে সম্পর্ক বড় হয়ে ওঠে নি; উঠলে বসের সঙ্গে মেলামেশায় সংযত হতো। বরং আরও সচ্ছল, আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একাগ্রতায় মধ্যবিত্ত এই নারী সমস্ত পিছুটানকে অগ্রাহ্য করেছে। নীলার ভাবনায় তা উঠে আসে–

> শ্যামলেন্দুর জন্যেই তার চাকুরিতে এত উন্নতি। মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু না বললেও একটা অলিখিত শর্তে ইতিমধ্যেই সই দিয়েছে সে– শ্যামলেন্দু তার ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এখন ওঠার মুখে, তরতর করে উঠছে শ্যামলেন্দু। সে এগোলে নীলাও এগোবে। তার মানে আরও টাকা, আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে সে দিশেহারা বোধ করতে চায় না। অসীমের এটা বোঝা উচিত।[৬১]

নীলার মনের এই জটিল কারিকুরি অসীম বোঝে নি বলেই নিজের চাকুরিকে অবলম্বন করে স্বামীকে ত্যাগের কথা ভাবে। চাকুরি না থাকলে তার মনোজগতের এরূপ ভাবনা বাস্তবায়িত

---

৬০ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-২, পৃ. ৩৭

৬১ তদেব, পৃ. ১৭

হতো না। সে কারণে– 'আজকাল চাকরিতে একটু বেশি মনোযোগ দেয় নীলা।'[৬২] নগরমনস্ক এই নারী শেষপর্যন্ত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে নি, বাধা দিয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং কন্যা টিনার বন্ধন।

চাকুরিক্ষেত্রে দ্রুত পদোন্নতির জন্য বসের সান্নিধ্য লাভ সত্ত্বেও নারী কর্মক্ষেত্রে সুখী হয় নি; অনবরত চলতে থাকে কলিগদের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই। দ্বন্দ্ব-সংকুল চৌকাঠ ডিঙোনোর পর মেয়েদের ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় চাকুরিক্ষেত্রেও। 'সিঁড়ি' গল্পে সিনিয়র কলিগ রঞ্জনার আকাঙ্ক্ষিত পদ বসের সহায়তায় নীলা খুব দ্রুত লাভ করায় এবং বেশি ইনক্রিমেন্ট পাওয়ায় তাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে বিস্তীর্ণ লবণাক্ত সমুদ্র। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য–

> কাজের অভিজ্ঞতায় আর চাকরির মেয়াদে রঞ্জনা তার চেয়ে সিনিয়র। জ্যাক চলে গেলে রঞ্জনাই উঠত। নীলা তার বাধা। জায়গা একটাই। নীলা উঠলে সে নামবে। গতবার ইনক্রিমেন্টের অঙ্ক শুনে বলেছিল, 'ওর অর্ধেকটা কাজের জন্য, বাকিটা কিসের জন্য বুঝে নাও। গ্ল্যামারে অবসেসন আছে শ্যামলেন্দুর, সেজন্য অ্যাডভান্স দিয়ে রাখে।'[৬৩]

বিশ শতকের শেষার্ধে বিশেষ করে আত্মিক জাগরণ, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও চাকুরিক্ষেত্রে উচ্চ সম্মানের তাগিদে নাগরিক চাকুরিজীবী বাঙালিনীর বিবাহিত জীবনের সংস্কারকে নিমেষের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে যে চারিত্রিক পালাবদল ঘটেছে, তা প্রকাশিত দিব্যেন্দুর নীলা চরিত্রের মধ্যে।

'ফিরে আসা' (নবকল্লোল, ১৩৭৭) গল্পে চাকুরিজীবী নাগরিক মধ্যবিত্ত দম্পতির পরিচয় পাই। অশোক ও মণিকা। স্ত্রী মণিকার মুখে তাদের জীবিকার কথা মেলে– 'আমরা দুজনেই চাকরি করি।'[৬৪] চাকুরিজীবী এই নাগরিক দম্পতির একমাত্র আদরের স্থূল ছোট্ট ছেলে– বিল্টু। কর্মরতা বিবাহিত নারীকে তার চাকুরিসত্তার পাশাপাশি মাতৃসত্তার দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অফিসের নিয়ম-বাঁধা কর্মের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারায় অবহেলিত হয় মাতৃসত্তা। ফলস্বরূপ, সন্তানের প্রতিপালনের জন্য নির্ভর করতে হয় 'বাচ্চার কাজ জানা লোক'-এর ওপর। অফিসকর্মী মণিকাও সেই পথের পথিক। কারণ, স্বামীর সঙ্গে তার চাকুরিও সংসারে সচ্ছলতা রক্ষার অন্যতম সূত্র। মণিকার ভাবনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়– 'হুট করে

---

৬২ তদেব, পৃ. ২৯

৬৩ তদেব, পৃ. ২৮

৬৪ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ২৭৯

চারশো টাকার চাকুরি ছেড়ে দেওয়া সহজ নয়, সংসারের দিক থেকে ভাবলে উচিতও নয়।'[৬৫] নির্বাচিত যে মহিলাটি বিল্টুর দেখা-শোনা করত, অজ্ঞাত কোনো কারণে 'আসছি' বলে চলে যাওয়ায় একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মণিকাকে একটানা দীর্ঘদিন অফিস কামাই করতে হয়। অনেক সময় মাতৃত্ব নামক অমোঘ অনুভূতির টানে চাকুরির থেকে সন্তানের পরিচর্যা নারীর কাছে বড় হয়ে ওঠে। তবে চাকুরিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে না পারার জন্য মেজাজ ঠিক থাকে না। কারণ, চাকুরির মধ্যে নিহিত আছে তার আত্মমর্যাদা কিংবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য—

> মণিকার মেজাজ খিচড়ে থাকল। আজ নিয়ে তেরো দিন হল সে অফিস কামাই করছে।... চাকরিটা যদি শেষপর্যন্ত ছাড়তে হয় তাহলে অনেকগুলি টাকা ক্ষতি হবে।[৬৬]

চাকুরি রক্ষার তাগিদে পঁচিশ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুনর্বার নির্বাচন করে বিধবা শরৎবালা দাসীকে, ছেলে তত্ত্বাবধানের জন্য। এবং চাকুরি অটুট রাখতে পারার খুশিতে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে যায়; অনেক অনেক দিন পরে।

কিন্তু এই খুশি বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। চারদিন পরে অফিস থেকে ফিরে এসে মণিকা অবাক হয়; শরৎবালা পলাতক। মণিকা পুনরায় চিন্তিত হয়ে ওঠে নতুন লোক না পেয়ে 'অনেকগুলি টাকা' অর্থাৎ চাকুরির ইতি সম্পর্কে—

> যথানিয়মে মণিকার অফিস যাওয়া বন্ধ হল আবার। এবং নতুন লোক না পেয়ে মণিকা ধরেই নিল, এবার তাকে চাকরি ছাড়তে হবে। এবং সে বিমর্ষ হয়ে থাকল।[৬৭]

আর্থিক সচ্ছলতা ও আত্মপরিচয় নির্মাণের একান্ত অবলম্বন চাকুরি এবং অন্যদিকে সন্তানকে উপেক্ষা করতে না পেরে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিনীর হৃদয়ের দ্বান্দ্বিকতাকে নগরজীবনের মনস্বী কথাকার দিব্যেন্দু পালিত মণিকার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তবে, প্রায় একমাস পরে 'কাজটা খালি আছে বউদি?'[৬৮] বলে শরৎবালা ফিরে এলে মণিকা আশার আলো দেখে এবং বলে— 'দাদাবাবু না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো'—।[৬৯] চাকুরিকে রক্ষার তাগিদে আত্মপরিচয়ের মুখাপেক্ষী মধ্যবিত্ত নারী মণিকা সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে শরৎবালা কাজে রাখবে তা গল্পকার না বললেও পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কর্মজীবন এবং মাতৃত্বের দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত নারীর মনের অন্দর মহলের বিবিধ ভাঁজকে

---

৬৫ তদেব

৬৬ তদেব, পৃ. ২৭৯-২৮৪

৬৭ তদেব, পৃ. ২৮৫

৬৮ তদেব, পৃ. ২৮৬

৬৯ তদেব

দিব্যেন্দু সার্থকভাবে এখানে চিত্রিত করেছেন। গল্পের নাম– ফিরে আসা। তবে এই ফিরে আসা কেবল শরৎবালার নয়, মণিকার চাকুরি জীবনে ফিরে আসাকেও সমানভাবে ব্যঞ্জিত করে।

বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই স্বামী মারা যাওয়ায় 'দেড় ডবল ছায়া' (রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৭৩) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অতসীকে পিতার গৃহে আশ্রয় নিতে হয়। অতসীর ভাবনায় তা ব্যাখ্যাত–

> বিয়ের ছমাসের মধ্যেই অম্বরনাথ মারা গিয়েছিল ধনুষ্টঙ্কার হয়ে। তখনো বাবা বেঁচে।... বাপের বাড়িতে তাকে পৌঁছে দিয়ে অম্বরনাথ ফিরে গেল আসানসোলে। কদিন পরে খবর এল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কারণটা তখনও জানা যায়নি। অতসী ছুটেছিল স্বামীকে দেখতে। ফিরে এল কালো শাড়ি পরে। আর ফিরে যায়নি।[৭০]

তবে অতসী সন্তান-স্ত্রী পরিবৃত দাদা প্রমথেশের সংসারে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে ওঠে নি। সে চাকুরিজীবী। চাকুরি তাকে দান করেছে আর্থিক স্বাবলম্বন। আর এই স্বাবলম্বন তাকে পরিবারে দিয়েছে সম্মান এবং বাইরে কর্মী নারীর তকমা। অর্থাৎ অতসীর বড় আইডেন্টিটি সে নিজে নয়, তার জব। নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ এবং প্রস্থানের জব নামক বাউন্ডারি অবসরের পরে থাকে না। মুছে যায় কর্মী নারীর আইেডন্টিটি এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি। একদিন সময়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা এই গল্পে গল্পকার সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নারীর চাকুরি থাকাকালীন জীবনের সুখকে ব্যঞ্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে অবসরের পরের দিনের জীবনচর্যার রূপান্তরকে ব্যক্ত করেছেন। এ ছবি নাগরিক পরিবেশে বর্তমানে অজস্র। অতসীর চাকুরি নেই, নেই আর্থিক স্বাবলম্বন; তাই নেই পরিবারের মধ্যে 'খাতিরও'। অভ্যাসবশত নটার সময় খিদে পেলেও দাদার সঙ্গে আর ভাত মেলে না; মেলে শুকনো রুটি কিংবা মুড়ি। প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় এরূপ পরিবর্তন অতসীকে আঘাত করে। বুকে ঘনিয়ে ওঠে মেঘ, কিন্তু কাঁদতে পারে না। কান্না তো দীনতার পরিচায়ক। বরং তীক্ষ্ম হৃদয়জ্বালা নিয়ে বলে ওঠে– 'অফিস যাচ্ছি না বলে কি বেশি ভাত খাব বউদি।'[৭১]

অফিসের প্রথম দিনে চেয়ারে বসে অতসী যে আর্থিক স্বাবলম্বন ও আত্মমর্যাদার স্বাদ পেয়েছিল, 'রিটায়ার' নামক একটি শব্দ সেই স্বাদকে বিস্বাদ করে দেয়; এবং ঠেলে দেয় অভাবিত অসহায়তার দিকে। দিব্যেন্দু অতসীর মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবনের সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন। অতসীর পাশাপাশি রমা, মিনতি, চন্দ্রাণী, দীপালি, শীলা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমুখ

---

৭০ তদেব, পৃ. ২৩৮

৭১ তদেব, পৃ. ২৩৭

কর্মী নারীর প্রসঙ্গ এখানে উল্লিখিত। চাকুরিকে অবলম্বন করে তাদের জীবনের চালচিত্র বা রূপান্তর গল্পকার বিশ্লেষণ করেন নি; তবে তাদের উল্লেখ অতসীর বদলে যাওয়া জীবনবৃত্তান্তের পরিস্ফুটনে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

চাকুরি নারীকে দান করে ব্যস্ততা। শেখায় ঘণ্টা বেঁধে সময় বিক্রি করার কৌশল। নিয়মমাফিক টাকা রোজগারের এই কৌশলের পরিসমাপ্তি ঘটলে নারীর জীবনে নেমে আসে অসহায়তা। অনেক সময় অবিবাহিত নারী বিবাহকে অবলম্বন করে সেই অসহায়তাকে মোচন করে। তবে সেটিই একমাত্র পথ নয়; অনেকক্ষেত্রে অসহায়তা নামক মানসিক 'ধাপ্পাবাজি'কে দূর করার জন্য নারী নির্বাচন করে যৌনতাকে। 'একদিন অনেক রাতে' গল্পের নীলা তার অন্যতম উদাহরণ। কিছুদিন পূর্বে সে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল; অনিবার্য কারণে সেটা আর অব্যাহত নেই– 'মাঝখানে শ্যামবাজারের কাছে একটা স্কুলে লিভ ভ্যাকান্সিতে শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছিল, মাস চারেক আগে সেটাও গেছে।'[৭২] তখন থেকেই বাড়িতে বসে শুরু হয় 'মুঠোয় ইঁদুর ধরে' কম্পিউটার নিয়ে খেলা। কখনোবা খুড়তুতো বোন শ্বেতার সঙ্গে বাজারে কিংবা সিনেমা, নাটক দেখতে যায়। তাতে মন সুস্থ না হওয়ায় শ্যাম নামক 'প্লে বয়ের' দ্বারস্থ হতে চেয়েছে একাকিত্ব দূরীকরণের ওষুধ হিসেবে–

> সেদিন অনেক রাতে গোটা বাড়ি স্তব্ধ হয়ে গেলে শ্বেতার ঘরের দরজায় এসে টোকা দিল নীলা। শ্বেতা জেগে ওঠার পর অদ্ভুত চাপা কিন্তু অনুনয়ের গলায় বলল, 'কাউকে বলিস না। শ্যামের সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করিয়ে দিবি? ওকে আমার ভীষণ দরকার–'[৭৩]

'লিভ ভ্যাকেন্সি'র মতো ক্ষণিকের চাকুরি নাগরিক বাঙালিনীকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করলেও, সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে একাকিত্ব নামক কুহকজাল নারীকে কীভাবে অধিকৃত করে তার অন্যতম সাক্ষ্য 'একদিন অনেক রাতে' গল্প এবং গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলা।

'মাছ' গল্পের আর এক পিঠ 'এক ঋতু' (দেশ, ১৩৬৯) গল্পটি। পারিবারিক অসচ্ছলতা মোচনের একমাত্র উপায় নায়িকা চরিত্র সুমিত্রার চাকুরি। সুমিত্রার মুখেই তার চাকুরি জীবনের সাফল্যের কথা বর্ণিত– 'তাহলে সত্যি কথাটি বলি, এবার এক সঙ্গে দুটো ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছি। আর অফিসে গিয়েই খবরটা পেয়েছি।'[৭৪] সুমিত্রা সুনীলকে ভালোবাসে। আনন্দের মুহূর্তে তাই

---

৭২ দিব্যেন্দু পালিত, একদিন অনেক রাতে, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৯

৭৩ তদেব, পৃ. ১৪

৭৪ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৮৭

সে প্রণয়াস্পদকে উপহার দেয়– 'ব্যাগ খুলে হলুদ রঙের নতুন সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিল সুমিত্রা।'[৭৫] ছোট হলেও সুমিত্রা স্বাবলম্বী বলেই সংসারের দায় বহনের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেমতো মনের মানুষকে উপহার দিতে পেরেছে। বাবা, মা, বোনকে নিয়ে এই নারীর সংসার। চাকুরির বেতনে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার্থে অপারগ হওয়ায় টিউশনির খোঁজ করে। সে কারণে, বান্ধবীর বিয়েতে যাওয়ার পথে সহকর্মী প্রদত্ত ঠিকানায় টিউশনিটা পাওয়া যাবে ভেবে খোঁজ করায় কথা অসন্তুষ্ট হবে জেনেও সুনীলকে বলে– 'শোনো এখনও তো হাতে কিছু সময় আছে। ভেবেছিলাম সেই ট্যুইসনিটা একবার খোঁজ করে গেলে হয় না।'[৭৬] এবং ভাবে টিউশনির পঞ্চাশ টাকা পেলে ছোটবোন চিত্রা যে মেয়েটাকে পড়ায় সেটা বাদ দেবে, কারণ সামনে তার ফাইনাল পরীক্ষা।

পিতার সংসারের কথা ভাবতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে চাকুরিজীবী নারী নিজের বিয়ের কথা, নিজের সংসার নির্মাণের কথা প্রায় ভুলে যায়। সুমিত্রাও ভুলে গেছে। ইদানিং সুনীলকে তাই সে ভালোবাসার কথা বলে না। আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে চাকুরি আর সংসারে। সংসার এবং চাকুরির দ্বন্দ্বে পরিশ্রান্ত এক নারী দিব্যেন্দুর সুমিত্রা। পরিশেষে, 'ওরা মরুক নিজে বাঁচি'[৭৭] বলে বিয়ের কথা ভাবলেও শিকড়ের টান ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা তার পথে বাধা হয়ে এসেছে এবং বিয়ের প্রসঙ্গও উপেক্ষা করে দৃষ্টি রেখেছে পিতার সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার দিকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য–

> শীতের 'এক ঋতু' নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন দিব্যেন্দু, সেখানে বরং গল্পহীনতার সঙ্গে গল্পের একটা আপোস লক্ষ করা গেছে। এ গল্পের মূলে রয়েছে প্রেম এবং সুমিত্রা-সুনীল নামে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা, দুজনেই চাকরি করে অথচ পারিবারিক অসচ্ছলতা বিয়ের প্রধান বাধা।[৭৮]

চাকুরিকে অবলম্বন করে নারী আর্থিক স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা লাভ করলেও কর্মক্ষেত্রে নারীকে অনেক সময় যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়। বর্তমানে এই কুৎসিত ছবি ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। এই গল্পেও তা লক্ষ করা যায়। চৌধুরী নামের সদাগরি অফিসের এক অফিসার অকারণে সুমিত্রার শরীরে হাত দিতে চায়। সুমিত্রার শারীরিক হেনস্থার এই ছবি সুনীল ও তার কথোপকথনে উঠে আসে–

---

৭৫ তদেব

৭৬ তদেব, পৃ. ৯০

৭৭ তদেব, পৃ. ৮৭

৭৮ শ্রাবণী পাল, নগরদর্পণে আমাদেরই মুখ : দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প, পূর্বোক্ত প্রিয়দর্শিনী, পৃ. ১৫৮

সদাগরি অফিসের মেজ কেরানি, আসলে নির্দোষ সাপ।

'যে নাম বলেছিলে যেন, চৌধুরী না?'

'হ্যাঁ।'

'হাত ধরতে চায়?'

'শুধু হাত কেন, সব সময়ে গদ গদ ভাব। দেখলে গা জলে যায়।'[৭৯]

নারী অনেক সময় এরূপ কুকর্মের প্রতিবাদ করে, আবার আর্থিক সচ্ছলতার চাবিকাঠি চাকুরির তাগিদে নিজেকে সজাগ রেখে সব অপমান মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। দিব্যেন্দু গল্পটিতে অফিসের বাঁধা রুটিনে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত, অসহায় অফিসকর্মী সুমিত্রার চাকুরিকে অবলম্বন করে পরিবারকে রক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সর্পিলতার জালে অনেক সময় নারী যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে তার প্রতিচ্ছবিকেও অঙ্কন করেছেন।

'অপরূপ কথা' (শারদীয়া প্রতিক্ষণ, ১৪০০) গল্পটিতে গল্পকার ঘটনার চেয়ে চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেখানে আমরা দেখতে পাই সাদা-কালোয় গড়ে ওঠা বিভিন্ন চরিত্রকে। এমন এক চরিত্র– সোহিনী। সে বড় একটি অফিসের কর্মচারী। ফলস্বরূপ, প্রত্যহ যেতে হয় সময় কেনা-বেচার অফিস নামক বাজারে। মাসান্তে যা হাতে এনে দেয় হাজার দু'য়েক টাকা। যে টাকার ওপর নির্ভর করে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি অর্জন করেছে স্বতন্ত্র একটা আইডেন্টিটি। আটাশ দিন পরে সোহিনীর বিয়ে। সে কারণে, বাবা তাকে 'নটায় বেরোনো, সাজটাই ফেরা'র মতো কষ্টসাধ্য কাজ না করে রেজিগনেশন দিতে বলে–

> সকালে যখন চাকরিতে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, মা বলেছিল, 'মাঝখানে আর কটা দিন। এখন আর অফিসে যাওয়ার কী দরকার। বাবার কথা মতো রেজিগনেশন দিয়ে বাড়িতে থাকলেই পারতিস!'[৮০]

কিন্তুচাকুরি যে আইডেন্টিটি দিয়েছে শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত যুবতী তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় নি। মায়ের মুখের ওপর বলে– 'রেজিগনেশন দিতে হবে কেন! ছুটি নেব। দরকারে উইদাউট পে ছুটি নেব।'[৮১] বিধাতার অমোঘ পরিহাসে বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে না ওঠায় সে ভেঙে পড়ে নি, বরং উপার্জনশীল আধুনিক এই নারী নিজের চাকুরিকে অবলম্বন করে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করতে চেয়েছে। বিয়ে,

---

৭৯ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-১, পৃ. ৮৬

৮০ দিব্যেন্দু পালিত, পূর্বোক্ত গল্পসমগ্র-২, পৃ. ৪২৫

৮১ তদেব

সংসার, দাম্পত্য প্রভৃতি আবেগগুলো নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি চাকুরি-ই হয়ে উঠেছে তার জীবন নির্বাহের প্রধান অবলম্বন।

চাকুরিজীবী নয় চাকুরিপ্রত্যাশী মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীকে প্রত্যক্ষ করা যায় 'অন্তরা' (নবকল্লোল, ১৪০০) গল্পটিতে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে চাকুরিপ্রত্যাশী নারীকে এই অধ্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো কেন? উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, চাকুরিপ্রত্যাশী অন্তরার মধ্য দিয়ে চাকুরিজীবী নারীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির জগৎ সম্পর্কে পাঠক আরো বেশি অবহিত হয়ে ওঠে। সে কারণে গল্পটির ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্তরা। শাশুড়ি কনক, স্বামী কৌশিক এবং হোস্টেলে থেকে পাঠরত দেওর শৌভিককে নিয়ে তার সংসার। স্বামী বিখ্যাত ক্রিকেটার; তবে ব্যাঙ্কের চাকুরির সঙ্গেও যুক্ত। খেলার তাগিদে প্রায় সর্বদা কৌশিককে বাইরে থাকতে হয়, অন্যদিকে শাশুড়ি কনক নিজের মনে পূজা-অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত। যা অন্তরাকে নিয়ে যায় একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার অনুবিশ্বে। তাই সে ভাবে– 'এভাবে ভাল লাগছে না, চাকরির খোঁজ করবে।' চাকুরি মাসের শেষে হাতে এনে দেয় টাকা। যাকে অবলম্বন করে মানুষ নিজের মনোবাসনাকে চরিতার্থ করে। তবে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যই নয়, অনেক সময় নিজের একাকিত্ব দূরীকরণের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে ব্যস্ততম চাকুরিক্ষেত্রকে। এ ছাড়াও, চাকুরিকে অবলম্বন করে লাভ করে একটি নতুন আত্মপরিচয়। অন্তরার মুখে সেই কথাই ধ্বনিত–

> 'চাকরি করলে টাকা পাওয়া যায়। তখন টাকাটাকেও মনে হয় প্রয়োজন। কিন্তু, শুধু টাকা রোজগারের জন্যেই সকলে চাকরি করে না।'... যোগ্যতার ব্যাপারটাও এসে যায়।[৮২]

স্বামীর পরিচয়ে অনেক সময় স্ত্রীও পরিচিতি পায়। নির্মিত হয় পৃথক একটি সত্তা। সে কারণে, অন্তরা একসময়ের বিখ্যাত উঠতি ক্রিকেটার তথা সেলিব্রিটি কৌশিককে প্রায় জোর করে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসে ছুটে গিয়েছিল, বিখ্যাত হওয়ার আশায়। কিন্তু বর্তমানে বারেবারে ক্রিকেট-জগতে ব্যর্থ হওয়ায় কৌশিক ব্যাঙ্কের চাকুরিকে অবলম্বন করে থাকতে চাইলে অন্তরা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস অনুভব করে এবং ভাবে– 'খেলা ছেড়ে দেবে!... ব্যাঙ্কে চাকরি করতে যাবে, বাড়ি ফিরবে... তাহলে কোন পরিচয়ে নিজেকে চেনাবে অন্তরা।'[৮৩] পরিচিতি নির্মাণে স্বামী অপারগ হওয়ায় অন্তরা চাকুরিকে অবলম্বনের কথা ভেবে বাধা সত্ত্বেও চাকুরির খোঁজ করেছে। আত্মপরিচয় নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয় তার একাকিত্ব মোচনের প্রচেষ্টাও– 'কৌশিক

---

৮২ তদেব, পৃ. ৪৩৪

৮৩ তদেব, পৃ. ৪৩৬

অখুশি হবে জেনেও, নিজের বদ্ধ অবস্থাটা কাটাবার জন্যে আড়ালে চাকুরির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল অন্তরা।'[৮৪] কোন আশায়, কোন অভিপ্রায়ে কিংবা কোন ইচ্ছা নির্মাণের তাগিদে মধ্যবিত্ত বাঙালি নারী উপার্জনভিত্তিক কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত নিজস্ব স্টাইলে অন্তরা চরিত্রের মাধ্যমে এই গল্পে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষা উপযুক্ত আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় চাকুরির মধ্য দিয়ে। 'জ্যেটল্যাগ' (বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯৬) গল্পে রেখা ও মৃগাঙ্কশেখরের স্কলারশিপ পাওয়া একমাত্র কন্যা হৈমন্তী রিসার্চের উপলক্ষে বাইশ বছরে আমেরিকার প্লেনে ওঠে এবং 'ব্রাইট অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার'কে অবলম্বন করে লাভ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্থাৎ চাকুরি। এ প্রসঙ্গে তার ভাবনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য– 'ইউনিভার্সিটির রেফারেন্স লাইব্রেরির চাকরিতে আছে নিজেকে নিজের মতো করে টিকিয়ে রাখার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।'[৮৫] প্রথমদিকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের হাতিয়ার চাকুরি তার কাছে বড় হয়ে ওঠে; বিয়ে, সংসার প্রভৃতি ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দেয় নি। তবে কিছুদিনের মধ্যে জাতি, ধর্মের বাঁধনকে অস্বীকার করে স্বনির্বাচিত পুরুষ মাহাবুবকে বিয়ে করে। চাকুরি পায়ের তলায় যে অবলম্বন জুগিয়েছে, জুগিয়েছে যে মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস তার ওপর নির্ভর করে উপনীত হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্তে। অনিবার্য কারণে এক বছরের মধ্যে তাদের ডিভোর্স হলেও হৈমন্তী ভেঙে পড়ে নি; বরং চাকুরির ওপর ভর করে ভিন্ন ফ্ল্যাটে উঠে এসে নির্বাহ করেছে সচ্ছল জীবন। চাকুরি সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক নিরাপত্তা দান করলেও সূক্ষ্ম কোনো একাকিত্ববোধ অনবরত দংশন করায় শিকড়ের টান বাবা-মায়ের সংসারে ফিরে আসে এবং যুক্ত হয় ইংরেজি সংবাদপত্রের অফিসে। চাকুরি যে পরিচয় কিংবা সম্মান প্রদান করে সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য দেশে এবং বিদেশে বাঙালি নারী হৈমন্তীর চাকুরিকে আঁকড়ে থাকার এবং কর্মকে অবলম্বন করে মানসিক অবসাদ মোচনের ইতিবৃত্ত গল্পকারের লেখনীতে এই গল্পে ব্যাখ্যাত। 'চিঠি' (রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৩৭৫), 'তৃতীয় ব্যক্তি' (সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৩৯১), 'নীলা' (১৩৯৪), 'ঘুম' (দেশ, ১৩৮০) প্রভৃতি গল্পগুলোয় দিব্যেন্দু পালিত চাকুরিকে অবলম্বন করে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের নারী নীলা, নীলিমা ও মণিকার বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবিকে নিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

সংসারের দায়ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত চাকুরিজীবী নায়িকা চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় দিব্যেন্দুর 'হয়তো, হয়তো নয়' (সানন্দা, ১৪০৩) গল্পটিতে। নাম– ভাস্বতী। গল্পকার এখানে শ্রীলেখা, ইরা, মঞ্জরী নামক একাধিক কর্মী নারীর প্রসঙ্গ নিয়ে এলেও ভাস্বতীর জীবনের চড়াই-উৎরাই-ই মূল উপজীব্য। প্রায় অন্ধ বাবা, মা, দুটো ভাই এবং জয়ন্তী ও শ্রীমতী নামক

৮৪ তদেব

৮৫ তদেব, পৃ. ৩৫৪

দুই বোনকে নিয়ে তার সংসার। ভাস্বতীর চাকুরির ওপর নির্ভর করে চলে মধ্যবিত্তের এই সংসার। ছোট্ট একটা অ্যাকসিডেন্টের অনুষঙ্গে গল্পকার পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন–

> বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সে যদি হাসপাতালে যেত, তাহলে খরচ-খরচায় জেরবার হওয়া ছাড়াও আরও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারত– হয়তো গোটা পরিবারটাই মুখ থুবড়ে পড়ত;... এ সংসারটা যে ভাস্বতীর রোজগারেই চলে![৮৬]

সে কারণে বিয়ের পাকা প্রস্তাব এলেও অনেক ভেবে-চিন্তে বাবা আদিনাথ এবং মা রেণু তাকে বিয়ের জগতে ঠেলে দেয় নি। বরং অভাবী সংসারের ভার বহনে প্ররোচিত করেছে। কারণ তারা জানে, ভাস্বতীর চাকুরিকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকবে মধ্যবিত্তের এই সংসার।

ভাস্বতী সজলকে ভালোবাসে, সজলও ভালোবাসে ভাস্বতীকে। কিন্তু ভালোবাসা পেয়েও অন্যান্য নারীর মতো ভাস্বতী ঘর বাঁধতে অপারগ। এই অপারগতার মূলে সে নিজে এবং তার অভাবী পরিবার। কিন্তু অস্থির সজল 'বিয়ে না করে ভালোবাসা যায় না' বললে কর্মীনারী ভাস্বতী শরীর দিয়ে প্রেমাস্পদকে আগলে রাখে– 'সেদিন সজলের বুক-করা হোটেলের ঘরে পরিকল্পনা মতো সজলের অধৈর্য মেটাতে অবাধ হল ভাস্বতী।'[৮৭] এবং অপেক্ষা করে এমএ পাস বোন জয়ন্তীর চাকুরি পাওয়া পর্যন্ত। কারণ, বাবার স্বল্প পেনশনে অভাবী সংসারে সচ্ছলতার ছায়া পড়ে না। শেষ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে সজল ভাস্বতীকে না জানিয়ে চাকুরিতে ট্রান্সফার নিয়েছে। আসলে ভাস্বতী তাকে প্রতারক হতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তবে চাকুরিই পরিশেষে ভাস্বতীকে মানসিক অবসাদ থেকে টেনে বার করে আনে এবং নিয়োজিত করে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সম্বলিত পরিবারকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দানের কাজে। চাকুরি মধ্যবিত্ত কর্মীনারীর বেঁচে থাকার, আত্মপরিচয় কিংবা স্বাধিকার অর্জনের রসদ জোগানোর পাশাপাশি হৃদয়কে কীভাবে নিঃস্ব করে তোলে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। শুধু তাই নয়, গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত 'প্রশ্নগুলো' গল্পটিতেও পিতা-মাতা, ভাই-বোন সম্বলিত সংসারের দায়ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিনী মাধবীর সখ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এমনকি প্রেম, যৌবন কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মর্মন্তুদ প্রতিচ্ছবিকে অনুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করেছেন। নগর সভ্যতা চাকুরিজীবী নারীর হাতের মুঠোয় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিলেও অনেকক্ষেত্রে শিকড়ের টান অর্থাৎ পিতা-মাতার সংসারকে উপেক্ষা করার মানসিক বল দেয় নি; দেয় নি সুখী দম্পত্য কিংবা প্রেমও। বস্তুত দিব্যেন্দুর বেশকিছু গল্পের বিষয় তাই হয়ে উঠেছে– সাংসারিক নাগপাশে আবদ্ধ এবং প্রেমে-অপ্রেমে বেঁচে-বর্তে থাকা চাকুরিজীবী মানুষগুলো।

---

৮৬ তদেব, পৃ. ৪৮৬

৮৭ তদেব, পৃ. ৪৯১

চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর পরিচয় প্রসঙ্গে গল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের যে গল্পগুলো আলোচিত হলো, তাতে উঠে এসেছে নারীর বৈচিত্র্যময় কর্মজগতের কথা। এবং চাকুরিকে অবলম্বন করে পারিবারিক জীবনের বহুবিধ রূপ-রূপান্তরের কথাও। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্বের আর্থসামাজিক পালাবদলে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে যে সংকটের সূচনা; সেই আর্থিক সংকট মোচনের জন্য বেশিরভাগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিনী পুরুষের সঙ্গে তারা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। কেবল আর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বা স্বাধিকার নয়, আত্মপরিচয় নির্মাণের বাসনাও তার সঙ্গে যুক্ত। তবে সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে নারীকে ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে, কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে– সর্বত্র বিবিধ সংকট ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনো বা দাঁড়াতে হয়েছে একাধিক দ্বন্দ্বের সামনে– মাতৃসত্তা বনাম কর্মীসত্তা, কন্যাসত্তা বনাম প্রেমিকাসত্তা, কলিগ বনাম সে নিজে প্রভৃতি। এবং লড়াকু মন ও আপোসহীন স্পৃহা নিয়ে লড়ে যেতে হয়েছে চিরকাল। কর্মক্ষেত্রে উচ্চাশা, স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাস চাকুরিজীবী আধুনিক নারীকে এত বেশি মোহিত করেছে যে তার জন্য সংস্কার ভেঙে নিমেষে শরীরকে ব্যবহার করে প্রমোশনের শর্তরূপে। নাগরিক জীবনের অন্তঃস্থলে বসে দিব্যেন্দুর লেখক মন চাকুরিকে অবলম্বন করে সমকালীন আধুনিক নারীর জীবনচর্যা ও চারিত্রিক চালচিত্র বদলের প্রতিটি অনুপুঙ্খকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং নিরাসক্তভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন–

> নাগরিক ঘাত প্রতিঘাতগুলি চমৎকার ফুটে ওঠে, মানবিক সম্পর্কের ছোট বিশ্ব কেমন করে যেন অনেক বড় হয়ে ওঠে তার লেখায়। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েদের চরিত্রগুলি তিনি মেয়েদের মতো করে বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর গল্পের... মেয়েরা প্রথানুগ ডলপুতুল নয়, আমাদের মতোই জীবনের নানা সংঘাতের মধ্যে তারা লড়াই করে বেঁচে থাকে। নারী ও পুরুষ উভয়ের সংকটকে অনুভব করতে পারেন বলেই দিব্যেন্দু পালিত সমসময় স্পর্শ করতে পারেন।[৮৮]

প্রহ্লাদ রায় গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন এবং শিক্ষক, কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)। prallhadroy95@gmail.com

৮৮ মল্লিকা সেনগুপ্ত, সমকালকে স্পর্শ করতে পারেন, পূর্বোক্ত প্রিয়দর্শিনী, পৃ. ৬০